Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.09-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

ড. মুনমুন দত্ত
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Rabindranath Tagore was one of the pioneers of the agitation that was created in the world of education in the context of the renaissance of the nineteenth century. According to Tagore, Education is a man-making process, it explores the innate power exists within the human. He defined education as the all-round development of human life. Education that will not only create clerical workers but also spiritual development. He thinks that the moral and spiritual education is more important than bookish knowledge. Education which will eliminate all forms of inequality in the society and establish equality, remove superstitions and provide social awareness. According to Rabindranath, the ideal environment for this type of education is "Tapavan education". He felt that a curriculum should revolve organically around nature with classes held in the open air under the trees. Where students can develop their inner potential by learning in a natural environment. He wanted to make the education system life-oriented by developing the potential of the heart. He believed that a life-oriented education that will satisfy him as a creative.
Key Words: Education, Equality, Multifaceted Personality, Thoughtful and Creative, Tapoban Education.

মূল আলোচনা: ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার শিক্ষা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা পুরাতন ঐতিহ্যের অচলায়তন জনিত সৃষ্ট সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই নবজাগরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানুষের মননে, চিন্তনে ও আচরণে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের মননে, চিন্তনে ও আচরণে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা হল মানুষের সেই সংস্কৃতি, যা প্রক্রিয়াগতভাবে জ্ঞানের আদর্শকে সামাজিক মূল্যবোধের আকারে সংরক্ষণ করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখে। এই শিক্ষা মানুষের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করে ভবিষ্যৎ সমাজ ও সংস্কৃতির কাছে তাকে যোগ্য রূপে গড়ে তোলে। এই নবজাগরণের পেক্ষাপটে আবির্ভাব হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রাজা রামমোহন রায় ও ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা প্রচলনের কাজকে আরও প্রসারতা দান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার সাথে জীবনকে একাত্ম করে দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে মস্কোতে তার সমর্থনে সভায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় বক্তব্যটির খুবই প্রাসঙ্গিক,

> "শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত হল তাকে জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, তাকে জীবনের অংশ হতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় যথার্থ জীবনধারণের ফলে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয় যা সভ্য জগতের ইস্কুলে কলেজে প্রায়ই ঘটে - সে যেন এক খাঁচা, তার ভিতরে শিশুদের যত কৃত্তিম তথ্য জোগানো হয়। যথার্থ জীবনের মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারি।"[১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আমাদের জীবনকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে দুটি বিষয় জড়িত - এক, ব্যবহারিক দিক এবং দুই, ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিক। ব্যবহারিক দিকে মানুষ অর্থউপার্জনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে চালনা করে। অপরদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে মানুষ অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উত্তরণ ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্য দ্বিবিধ - জীবিকাঅর্জন এবং আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষার এই প্রথম লক্ষ্যটি অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে অপরিহার্য। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষা লাভ করে জীবিকা

অর্জনের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা পূরণের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ব্যবহারিক লক্ষ্যটি পূরিত হয়। অপরদিকে শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি অর্থাৎ আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার এই মূল লক্ষ্যে কাজ হল মানুষের মধ্যে মনুষত্ববোধ জাগরিত করে তাকে স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার উপলব্ধি করানো। এই শিক্ষা কেবল ইন্দ্রিয়গত শিক্ষা নয়, এই শিক্ষা হল বোধের শিক্ষা; এই শিক্ষা কেবল জ্ঞানচর্চা নয়, এই শিক্ষা হল জীবনচর্যাকে আত্মস্থ করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিকাঅর্জন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন - এই দুটিকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করলেও, এই দুটি লক্ষের মূল্যবোধকে এক করে দেখেননি। জীবিকাঅর্জন জীবনের ব্যবহারিক আবশ্যকতা হলেও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বসত্তার সামঞ্জস্য বিধানই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> "তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেনশনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পরিবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বমুখী করতে চেয়েছিলেন; জাতি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনুষ্যত্বের চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রধানত তিনটি দাবি পূরণ হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই তিনটি দাবি হল - সামাজিক দাবি, অন্ন-জীবিকার দাবি ও মনুষ্যত্বের দাবি। এই তিনটি দাবি পূরণের মধ্যে দিয়েই শিক্ষা মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

শিক্ষা মানুষের সামাজিক দাবি ও চাহিদারগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে। শিক্ষাই পারে মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করে সামাজিক সচেতনতা প্রদান করতে। সমাজে মানুষের মধ্যে বৈষম্য, বঞ্চনা, জাতপাতের ভেদাভেদ প্রভৃতি বিষয়গুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শেখায় মানুষের অর্জিত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের পুরাতন কুসংস্কারের বিশ্বাসকে দূর করে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে। ফলে শিক্ষা সমাজ থেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজে তার সুফল প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> "সেই যাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথা হচ্ছে - মানবো না মানাবো। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটু ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়।... পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহ শান্তির জন্য দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলা দেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন - মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভলতেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি না কি, মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।'... আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে, এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত - এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির ওপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা মানুষের অন্ন-জীবিকার দাবিকেও পূরণ করতে সাহায্য করে। জীবনধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অপরিহার্যতা এবং এগুলির চাহিদা পূরণের জন্য জীবিকা একটি স্বাভাবিক আবশ্যিকতা। শিক্ষা মানুষকে যুগের সাথে তাল রেখে জীবিকা লাভ ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার কাছে অন্ন-জীবিকার দাবিকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি যেমন আবশ্যক, তেমনি জীবিকা অর্জনের বিষয়টিও শিক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই তিনি শ্রীনিকেতনে শিক্ষার বিষয় গুলির মধ্যে হস্তশিল্প মৃৎশিল্প কাঠের কাজ গৃহ শিল্প কারুশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার

কর্মকেন্দ্রিক দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন, যাতে মানুষ জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,

> "একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটি স্বীকার করলেও, তিনি শিক্ষার মাধ্যমে অন্তরের বিকাশের দিকটিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে মনুষত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়না। মানুষ বলতে বোঝায় যার মাধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। মনুষ্যত্ব হল মানুষের চিরাচরিত বা শাশ্বত স্বভাব বা গুণ, যা মানবজাতি বাস্তব জীবনে যথাসাধ্য প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজেদের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, মনুষ্যত্বের দাবি পূরণে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্বের দাবি অনুসারে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষের জয় সুনিশ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "শিক্ষায় রয়েছে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের সক্ষমতা। মনুষ্যত্ব আর আদর্শ অক্ষুন্ন রাখার নৈতিক উদ্দীপনা। মানব সম্পর্কে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার সক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বললেন - 'শিক্ষার লক্ষ্য সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপন'। মনুষ্যত্বের দাবি পূরণে শিক্ষার শক্তি অপরিমিত বলে রবীন্দ্রনাথ বারংবার উল্লেখ করেছেন। মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনকে বলেছেন শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য। এই জাগরনে মানুষ যেমন ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা সাধন করে, অন্যকেও মনুষ্যত্বে সম্মানিত করে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবনের যে তিনটি দাবি পূরণের কথা বলেছেন, সেগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলি হল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশবিশেষ। যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে খন্ডিত করে তিনি সেই শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয় বলে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে খণ্ডকে একত্র করে পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তার মতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন বৈচিত্র না থাকায় সেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তর আত্মাকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়। তাই এই নিরস শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর জীবনে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অক্ষম। এ প্রসঙ্গে তিনি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের বলেন,

> "বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারতটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের সাথে শিক্ষালাভকে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বলে মনে করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের ভাবের ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে। মানুষের ভাবের ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যম হল ভাষা। ভাষা হল ভাবের বাহক। রবীন্দ্রনাথের মতে, যে ভাষা মানুষ জন্ম থেকেই শিখে আসছে, সেই ভাষায় ভাবের সংসার বা কথাবার্তা এবং শিক্ষাগ্রহণ সহজ হয়। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত, যার বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মতে, জন্ম থেকেই যে ভাষার সাথে শিক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে, সেই ভাষার পরিবর্তে যদি হঠাৎ করে কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া চালু হয়, তাহলে সেই ভাষা নতুন করে শিখে তার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে অনেক সময়েই শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষা এবং তার

ব্যবহারের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ তুল্য। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা যতটা সহজ পাচ্য হবে, বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তা ততটা সহজ হবে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিক্ষা সংস্কার’ নামক প্রবন্ধে বলেন,

> “আমাদের মন তোরো-চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবীর রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়ে অহরহ যদি তাহার ওপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থ বিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টি লাভ করিবে কী করিয়া। প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারি এরপর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোঁড়াকে বাঁচিয়াছে। আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্য চর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে। যাহা গ্রহণ করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন।”[৭]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভাব-সঞ্চারের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার রূপে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিলেও তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। তিনি বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে অঙ্কুরিত করে তাকে ফলবান করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তার বিরোধ বিদেশী ভাষা নিয়ে নয়, মাধ্যম নিয়ে। তিনি মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, জীবনযুদ্ধে ইংরেজি ভাষাকে হাতিয়ার করার কথা বলেছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু কোন পক্ষপাতিত্বে নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পক্ষপাতিত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্য প্রতিষ্ঠা। তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে সকলের মধ্যে প্রবাহিত করতে চেয়ে ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, শহরবাসী-গ্রামবাসী, নারী-পুরুষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষায় বৈষম্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তৎকালীন সমাজে শিক্ষার অধিকার থেকে নারী সমাজকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর মতে শিক্ষা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয়, তাহলে মানুষ হিসাবে নারীরও সেই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। আর যদি নারীকে তার প্রাপ্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তাহলে নারীর কাছ থেকে মনুষ্যত্বের আশা করা অর্থহীন। কিন্তু মানুষ হিসাবে নারীরও মনুষ্যত্বের দাবি আছে, তাই নারীরও শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী ছিল। সেখানে মনে করা হত, নারীকে শিক্ষা দিলে নারীর নিজস্ব স্বভাবের বিপরীত আচরণ করবে। কিন্তু যে শিক্ষা পুরুষকে তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করতে শেখায় না, সেই শিক্ষা কি করে নারীকে তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করতে শেখাবে! পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আশঙ্কা হল, নারীকে শিক্ষা দিলে নারী তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে, নারীর কাজের অংশগুলি পুরুষদের ভাগে এসে পরবে। তাই তারা নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই মনোভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> “যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইয়লে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকের প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে - বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শিখে তবে য ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।”[৮]

রবীন্দ্রনাথ নারী ও পুরুষ সকলের মধ্যে শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন। তার মতে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজের অংশ। সেই সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা পুরুষের জন্য উন্মুক্ত, কিন্তু নারীর জন্য নয়। নারীকে শিক্ষা দেওয়া হলে নারী তার স্বভাব ও কর্ম থেকে বিচ্যুত হবে - পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই আশঙ্কার বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মতে, একই শিক্ষা যদি পুরুষকে তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত না করে তাহলে নারীকেও তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত করবে না। তাই তিনি নারী শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তবে নারী ও পুরুষের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে তিনি অল্পবিস্তর প্রভৃতি স্বীকার করেন। তার মতে নারী ও পুরুষের কর্মজগতে ভিন্ন ভিন্ন। তাই শিক্ষার বিষয় সুচিকে এমনভাবে করা উচিত যাতে শিক্ষাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সুবিধা হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মন ও আত্মার স্বাধীনতা। তার শিক্ষা পদ্ধতির তিনটি প্রধান নীতি হল স্বাধীনতা, সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সক্রিয় আলাপন। শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বাধীনতার

বিষয়টি প্রায়শই উপেক্ষিত। শিক্ষার কারখানার অফিস স্কুল কলেজ গুলির নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে প্রকৃতি থেকে, প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। শিক্ষা জীবন প্রবাহের তালিকায় চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কৃত্তিম হয়ে উঠেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা কেরানী উৎপন্ন করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত স্বাধীন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত কাঠামোর মধ্যেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন। তার মতে এই শিক্ষা পদ্ধতি যেমন দারিদ্রতা দূর করার সামর্থ্য যোগাবে তেমনি আনন্দ ও স্বাধীনতাও থাকবে, । এই কারণে তিনি শিক্ষার্থীর পাঠ্যসূচির মধ্যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির পাশাপাশি সাহিত্য ও সংগীতকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। অর্থাৎ তিনি মস্তিষ্ক চর্চার পাশাপাশি হৃদয়ের অভাব পূরণকেও শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই হৃদয়বৃত্তির অভাব পূরণের জন্য তিনি ইঁট-কাঠে ঘেরা বিদ্যালয় ও বিষয়াত্মক পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কে সমর্থন করতেন। প্রকৃতির খোলা আকাশের নিচে, গাছপালার শীতল ছায়ায় যে উৎকৃষ্ট শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব; তা ইঁট-কাঠ-পাথরের ঘেরা চার দেওয়ালের মধ্যে সম্ভব নয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে মানবমনের বিকাশের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> "...খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার একথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।... স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক।...তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও।... বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও - তাহা তোমার ইন্সপেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়া তাহাকে নিতান্ত অপেক্ষা করিয়ো না।"[৯]

শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক সজীব সক্রিয়তা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে। তিনি শিক্ষা বলতে মানুষের জীবনের সার্বিক বিকাশকে বুঝিয়েছেন।তার শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগরিত করে অন্তরের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটানো।রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কথা বললেও তাঁর শিক্ষা চিন্তার মধ্যে ব্যবহারিক দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। তিনি শিক্ষার বিষয়সূচীকে এমনভাবে সাজানো পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে মানুষের অন্তরে জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে কর্মকৌশল ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তিনি শিক্ষাকে যেমন আত্মিক বিকাশমুখী করতে চেয়েছেন, তেমনি শিক্ষাকে কর্মমুখী করার প্রয়াস করেছেন। আবার এই শিক্ষা পদ্ধতি যাতে সহজেই মানুষ আত্মস্থ করতে পারে তার জন্য তিনি উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তার মতে উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে মানব মনের বিকাশ যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, চার দেয়ালে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে তা সম্ভব নয়। তাই তিনি তপবন শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সরলীকরণ আনতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবনমুখী করতে চেয়ে ছিলেন। জীবনমুখী শিক্ষাই মানুষকে মননশীল ও সৃজনশীল হিসাবে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র:

১. ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আরেক রবীন্দ্রনাথ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৭।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লক্ষ্য ও শিক্ষা, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৪৫।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার মিলন, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: সমাজচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৬৭-২৬৮।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৭৭।
৫. ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আরেক রবীন্দ্রনাথ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪০।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২৭৯।
৭. তদেব., পৃ. ২৯২।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫৫।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩০২-৩০৩।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
২. ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আরেক রবীন্দ্রনাথ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৩।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৩।
৫. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সমাজচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১।
৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১।